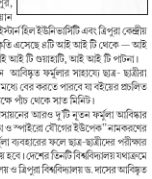

বিজ্ঞান জগৎ

পঞ্চাশ বছর পরও যা প্রাসঙ্গিক

মিহিরলাল রায়

শুরু তখন ষাটের দশক, সারা পৃথিবীজুড়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে ফুঁসছেন মানুষ ক্ষোভ এবং ঘৃণায়। যুদ্ধ বিরোধী প্রচারে অভিনব সাড়া। সে সব দিনগুলোতেই একটা নতুন বিষয়, নতুন বিপদের কথা শুনলেন মানুষ। পরিবেশের বিপদের কথা, যথেচ্ছ রাসায়নিক, কীটনাশক ব্যবহারের কথা। সে সময়েরই এক দুনিয়া কাঁপানো বই 'সাইলেন্ট স্প্রিং' অর্থাৎ 'শুদ্ধ বসন্ত'। রচয়িতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লেখিকা ও বিজ্ঞানী রাচেল লুই কারসন। জনপ্রিয়তার 'লুই' শব্দটা নেই, পরিচিতি শুধু রাচেল কারসন। বইটিতে লিখলেন তিনি, অধিক কৃষি উৎপাদনের জন্য তাঁর দেশ আমেরিকা এবং অন্যত্র তখন ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে যুগান্তকারী কীটনাশক। যার নাম 'ডি ডি টি' অর্থাৎ 'ডাই ক্লোরো ট্রাই ক্লোরো ইথেন'। শত্রু পোকা নষ্ট করে শস্য, তার নিধন নিশ্চিত করতেই তার ব্যবহার। কিন্তু সে সাথে এর প্রকোপে মরল আরও অনেক পোকা, জীবাণু, এমনকি যারা ফসলের বন্ধু পোকা তারাও। পাখিরা হারালো আহার। উপবাস এড়াতে যেতে চাইল অন্যত্র। কিন্তু যাবে কোথায়? আমেরিকাজুড়ে শস্য উৎপাদনের বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে। চলছে সব শস্য ক্ষেতে ডি ডি টি-র প্রয়োগ। ফলে পাখিদের বাঁচার পথ রইল না। ডি ডি টি বিষে মৃত কীট পতঙ্গই হতে লাগলো পাখিদের আহার্য। কুফল দেখা দিল পাখিদের দেহে এবং বিশেষ করে প্রজন্মের মধ্যে। পাখির ডিমের খোসা হল পাতলা। অসময়ে ডিম ফুটে বের হল বিকলাঙ্গ পক্ষী শাবক। পৃথিবীর আলোয় চোখ ফুটতে না ফুটতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে বিদায় নিল। এক দশক ধরে ডি ডি টি-র ব্যবহারে এক অদ্ভুত রহস্যময় অশুভ পরিবেশ গুটি গুটি পায়ে যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। সর্বত্র মৃত্যুর ছায়া। কৃষক তাদের পরিবারে অসুস্থতার বাড় বাড়ন্তের কথা বলছেন, শহরের চিকিৎসকরা তাদের রোগীদের মধ্যে নতুন নতুন ব্যাধির আক্রমণ দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ়। গরু-বাছুর আর ভেড়া এমন সব গৃহপালিত পশু রোগের কবলে পড়ে মৃত্যুর থাবায় প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। ফার্মে মুরগি ডিম দেয়, কিন্তু ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে না মুরগি ছানা। শূকর ছানাগুলো এখন চেহারাতে অনেকটাই ছোটখাটো এবং বাঁচেও মাত্র ক'টা দিন। জলাশয়, পাহাড়ি নদীগুলোও যেন নির্জীব। কারণ মাছ শিকারীরা কেউ এখানে আর আসে না। এখন সব মাছ মৃত্যুর করাল গ্রাসে গেছে হারিয়ে। আপেল গাছে ফুল আসে, আসে না ফুলে বসার মৌমাছি, ঘটে না পরাগ সংযোগ। এখানে-ওখানে দেখা কতিপয় পাখি এখন মৃতকল্প। ওরা প্রতিনিয়ত কাঁপছে। হারিয়েছে উড়ার ক্ষমতা। একদিন রবিন, ক্যাটবার্ড, ঘুঘু, জেস, রেন এবং আরও কত শত পাখির বৃন্দগানে মুখরিত হত প্রতিটি সকাল, এখন নীরবতা চারিদিকে। নৈঃশব্দ শস্য ক্ষেতে, বনানী আর জলাভূমিতে। এ যেন শব্দহীন বসন্ত। রাচেল কারসনের কাল্পনিক ট্র্যাজেডিতে সেটাই 'সাইলেন্ট স্প্রিং' অর্থাৎ 'স্তব্ধ বসন্ত'।

একজন জীব বিজ্ঞানী হিসেবে বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে রাচেল কারসন লেখিকা হিসেবে রচনা করলেন কাল্পনিক ট্র্যাজেডি — এক ভয়াবহ অমঙ্গলের ছায়া কিভাবে অদৃশ্যভাবে আমেরিকার ওপর নেমে আসছে। তাঁর বই 'স্তব্ধ বসন্ত'-র শেষ হয়েছে এই আশঙ্কায় 'প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ' ভাবনাটির জন্ম নিয়েনডার্থাল যুগের জীববিদ্যা ও দর্শনের ঔদ্ধত্য থেকে, যখন ভাবা হতো প্রকৃতির অস্তিত্ব কেবল মানুষের প্রয়োজনে। রাসেল কারসনের চতুর্থ বই 'সাইলেন্ট স্প্রিং'-এ হয়ত কিছুটা অতিরঞ্জনের ঝোঁক আছে, তবে তাঁর হুঁশিয়ারির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। দীর্ঘায়ু হননি তিনি। মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দুনিয়া কাঁপানো বই 'সাইলেন্ট স্প্রিং' প্রসঙ্গ এনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস' লিখেছিল — "একজন জীব বিজ্ঞানী হিসেবে মিস কারসনের অবস্থান ছিল এই যে, তিনি ছিলেন সত্যসন্ধানী এক প্রকৃতি বিজ্ঞানী এবং বিষাক্ত রাসায়নিকের এলোপাথাড়ি ব্যবহারে কী ঘটছে তার প্রতি গণচেতনা তৈরি করতে উদ্যোগী।" তাঁর নিজেরই ভাষায়, "ইট ইজ নট মাই কনটেনশন দ্যাট কেমিক্যাল ইনসেকটিসাইডস মাস্ট নেভার বি ইউজড......... (বাট দ্যাট) ইউ হ্যাভ পুট পয়জনাস এন্ড বায়োলজিক্যালি পটেন্ট ক্যামিকেলস ইনডিসক্রিমিনেটলি ইন্টু দ্য হ্যান্ডস অব পারসনস লার্জলী অর হোললি ইগনোরেন্ট অব দেয়ার পটেনশিয়ালস ফর হার্ম। আই কনটেন্ড ফারদারমোর দ্যাট উই হ্যাভ এলাউড দিস ক্যামিকেলস টু বী ইউজড উইথ লিটল অর নো এডভান্স ইনভেস্টিগেশন অব দেয়ার এফেক্ট অন সয়েল, ওয়াটার, ওয়াইল্ড লাইফ এন্ড ম্যান হিমসেল্ফ।"

বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬২-র ২৭ সেপ্টেম্বর। ডি ডি টি আবিষ্কারের ২২ বছর পর। সিন্থেটিক কীটনাশক হিসেবে ডি ডি টি-র প্রথম আবিষ্কার ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। আবিষ্কারের সাথে সাথেই শুধু মলে কীটনাশক হিসেবেই নয়, ব্যবহৃত হতে থাকে টাইশান, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি দূরীকরণেও। যাইহোক, ১৯৬২-তে 'সাইলেন্ট স্প্রিং'-র প্রকাশ ডি ডি টি এবং এরকম কীটনাশকের অপূরণীয় ক্ষতি সম্পর্কে গণজাগরণ সৃষ্টিতে জোগাল বিশেষ অবদান। ১৯৭২ সাল, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান শেষে মার্কিন দেশের 'এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি' বাধ্য হল যথেচ্ছভাবে কৃষিতে, জলাভূমিতে কীটনাশক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে। আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে এ সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত সকল রকমের প্রাণী দেহে, মানুষের শরীরেও ডি ডি টি বিষবৎ এবং প্রকৃতিতে একবার তার যোগান দিলে দু'শ বছরেরও বেশি সময়কাল সে বিষক্রিয়া ঘটায়। ডি ডি টি এবং ডি ডি টি সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক সমূহের অন্যতম সাংঘাতিক বৈশিষ্ট্য হল সেটা খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে চলে যায়। হয়ত কোন একটা বিশেষ অঞ্চলে ফসলের জমিতে তার প্রয়োগ হল, সেখান থেকে মুরগির খাবারে করে মুরগির ডিমে, সে থেকে মানুষের দেহে। এই বিষ মা থেকে চলে যেতে পারে শিশুদেহে, এমনকি মাতৃগর্ভ থেকেই। দুগ্ধবতী গাভীর মাধ্যমেও তা হতে পারে। এই সম্ভাব্য ক্ষতিকর পরিণতিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিতে, জলাভূমিতে এর যথেষ্ট ব্যবহারের উপর রাশ টানা হলেও আশির দশক পর্যন্ত একেবারে নিষিদ্ধ হয়নি। এখনও সে দেশে রপ্তানির জন্য উৎপাদন নিষিদ্ধ নয়। বহু দেশে কীটনাশক হিসেবে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও ম্যালেরিয়া দূরীকরণে রয়েছে এর ব্যবহার, আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও। যদিও ডি ডি টি ব্যবহারের হেরফেরে সংশ্লিষ্ট মশকের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন প্রত্যক্ষ করছি আমরা। এবং এজন্য আজও এ নিয়ে বিতর্ক দেশে দেশে আমাদের স্মরণ করায় রাচেল কারসনের কথা, "হাউ কুড ইনটেলিজেন্ট বিয়িংস সিক টু কন্ট্রোল অ্যা ফিউ আনওয়ান্টেড স্পিসিস বাই অ্যা ম্যাথড দ্যাট কনটামিনেটেড দ্য এনটায়ার এনভায়রনমেন্ট এন্ড ব্রট দ্য থ্রেট অব ডিজিজ এন্ড ডেথ ইভেন টু দেয়ার ওউন কাইন্ড।"

আমরা যদি বইটিতে উত্থাপিত কথাগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি, যদি বইটি প্রকাশের পর তার সমালোচকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর দেওয়া বয়ানগুলো লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, তিনি কিন্তু কোথাও কীটনাশকের পরিপূর্ণ বর্জনের সওয়াল করেননি। 'ডি ডি টি সংস্পর্শে ক্যান্সার' — এমন সরলীকৃত বক্তব্যও নেই তার। যদিও সে সময়ে এর ক্ষতিকারক দিকটি পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি, তার বক্তব্য ছিল — এ বিষয়ে চাই গভীর অনুসন্ধান এবং সতর্কতা। অথচ যারা মুনাফার জন্য এর উৎপাদন করে তারা এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। এ প্রেক্ষিতে সে সময় এবং আজও সম্পূর্ণ সাম্মানিক নিয়ন্ত্রণ না হলেও অন্তত সামাজিক জবাবদিহিতার দাবিদার আপামর মানুষ। আজকের সময়ে কৃষি জোগান আরও বেশি বেশি করে প্রযুক্তি নির্ভর এবং বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির খপ্পরে। নতুন নতুন উদ্ভাবন সমভাবনা সত্ত্বেও বিপর্যয়ের বার্তাও বহন করছে, যার সাম্প্রতিক উদাহরণ 'মডিফায়েড জিন ক্রপ' বা 'জিন পরিবর্তিত খাদ্যশস্য'। এ সময়ে তাই রাচেল কারসনের 'সাইলেন্ট স্প্রিং' আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। শুধু এজন্যই নয়, তার প্রতিবাদী সাহসও এ সময়ে আমাদের পাছে এক প্রেরণা।

বইটি রচনার ক্ষেত্রে তার মধ্যে যে প্রেরণা কাজ করেছিল, সে ইতিহাসও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৯৫৮ সাল, আমেরিকার 'বোস্টন হেরাল্ড' পত্রিকাতে প্রকাশিত হল একটা চিঠি। লেখক তাঁরই পুরনো বন্ধু ওলগা হকিন্স। ওলগা হকিন্স এবং তাঁর অন্য বন্ধু স্টুয়ার্টের দুই একর জমিতে ছিল অভয়কানন, ডাক্সবুরির পাওয়ার পয়েন্টে। অভয়কাননে ছিল পাখির আলয়। জায়গাটা ম্যাচাচুসেটস স্টেটের অধীন। সে সময় যখন আমেরিকায় কীটপতঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে এবং আকাশ থেকে আক্রমণ শানানো হচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিক দিয়ে, ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তাঁদের অভয়কাননে। পাখির আলয়ে মৃত্যুর মিছিল। এ নিয়েই চিঠি। এই চিঠিটিই রাচেলের ভাবনায় স্ফুলিঙ্গের কাজ করল, তাঁকে নাড়া দিল। তখন তিনি ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন। বিষয়টা তাঁর মনকে এতটাই নাড়া দিল যে, তিনি নেমে পড়লেন এই ধ্বংসযজ্ঞের কারণ ও ফলাফল খুঁজতে। তারই পরিণতি এই বই। চার বছর লেগেছিল বইটি লিখতে। বইটির পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকায়। পত্রিকাটির সম্পাদক তিনটি কিস্তিতে কিছুটা কাটছাঁট করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন পত্রিকায়। প্রকাশক হাফটন মিফিল আগ্রহী হয়ে ওঠেন এটি বই আকারে প্রকাশে। দারুণ সাড়া পড়ে বইটি প্রকাশে। প্রথম সংস্করণের দেড় লক্ষ বই অচিরে যায় ফুরিয়ে। আনুষ্ঠানিক প্রকাশ তারিখের আগেই বেস্ট সেলার হয় বইটি। শুধু আমেরিকাতেই নয়, ইংল্যান্ডেও বইটি বেস্ট সেলারের মর্যাদা পায়। ওখানে বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালের মার্চে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য জানেন বহু বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানবিদ। কিন্তু সেসব সাধারণ মানুষের কাছে হাজির করার জনপ্রিয় কৌশল জানা নেই অনেকের। রাচেল কারসন এ বিষয়ে ছিলেন দক্ষ। বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যকেও কবিতার ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করলেন।

বইটি বিজ্ঞানীদের কাছে এবং সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও কিন্তু বিতর্কের ঝড় উঠল। একদিকে রাসায়নিক শিল্প সংস্থা আর আমেরিকার সরকার। অন্যদিকে বিজ্ঞানী এবং লেখিকা রাচেল কারসন! অবশ্য পাশে ছিলেন তাঁর জীবনীকার লিন্ডালিয়ার এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি জিনেভান্স ডেভিস। বিতর্ক যে সবসময় সুস্থ পথে এগিয়েছে তা নয়, অর্থবল আর রাষ্ট্র ক্ষমতার আস্ফালন বিতর্কের সুস্থতাকে মাঝে মধ্যে বিপন্নও করেছে। শিল্প সংস্থার মুখপাত্র ড. রবার্ট হোয়াইট স্টিভেনস বললেন, "মিস রাচেলের 'সাইলেন্ট স্প্রিং'-র বেশিরভাগ দাবিই আসল ঘটনার বিকৃতি।" রাসায়নিক শিল্প সংস্থার অন্যতম মনস্যান্টো কোম্পানি পাল্টা আক্রমণ শাণাতে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করল একটা প্যারডি। বই লিখল 'দ্য ডেসোলেট ইয়ার', অর্থাৎ 'ঊষর বছর' নামে। শুরু তার এভাবে, "তারপর শুরু হল ঊষর বছরটি......।" বইটিতে শব্দ ছবিতে বিবৃত করল তারা— কীটপতঙ্গ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে আর জয় করে নিচ্ছে এলাকার পর এলাকা। আরেকটু এগিয়ে আমেরিকা সরকারের তৎকালীন কৃষি সচিব এজরা টাসট্ বেনসন দুম করে বলে বসলেন, 'রাচেল কারসন সম্ভবত একজন কমিউনিস্ট।' হিউম্যান ইভেন্ট ম্যাগাজিন রায় দিল, 'সাইলেন্ট স্প্রিং' বইটি উনিশ ও বিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত মানব জাতির পক্ষে ক্ষতিকর দশটি বইয়ের মধ্যে একটি।

যাইহোক, এতসব আক্রমণের মুখে রাচেল কারসন শান্তই রইলেন, কিন্তু অবিচল সত্য উদ্ঘাটন এবং তা উত্থাপনে। বললেন তিনি, "আমাদের অবশ্যই কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রকৃতিকে কীটপতঙ্গের হাতে ছেড়ে দেবার কথা আমি বলছি না। আমি চাইছি রাসায়নিকের পরিমিত, নির্বাচনমূলক এবং বুদ্ধিশীল ব্যবহার। এলোপাথাড়ি ব্যবহারে রাসায়নিক দিয়ে সবকিছু ঢেকে দেবার মতো স্প্রে করারই বিরোধিতা করছি আমি।" যাই হোক শেষ পর্যন্ত সমর্থন ক্রমশ ঝুঁকে পড়ল তাঁর দিকেই। 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস' লিখলো— '...... লেখিকা নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন, যেমনটা পেয়েছিলেন ডি ডি টি-র আবিষ্কর্তা।' মতামতটার মূল সুর, ডি ডি টি আবিষ্কর্তা যদি নোবেল পেতে পারেন তাহলে ডি ডি টি-র সর্বনাশ চিহ্নিত করার জন্য নোবেল পেতে পারেন রাচেল কারসনও। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও অনুরাগী প্রকৃতিবিদ উইলিয়াম ও ডগলাস ঘোষণা করলেন, "মানব জাতির জন্য বিশ শতকের বিষ প্রয়োগকারীদের বিরুদ্ধে একটি 'বিল অব রাইটস' দরকার। পরবর্তীতে সে দেশের 'এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি'-র যথেচ্ছ কীটনাশক ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা।

শুধু বই নয়, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও আজকের সময়ে আমাদের সকলের কাছে এক প্রেরণা। চেহারায় বেঁটে-খাটো, বাক সংযমী, সামনে তাকানো গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহিয়সী নারীর প্রকৃতিকে ভালোবাসা শুরু শৈশব থেকেই, তাঁর মার কাছ থেকে। স্কুল ও কলেজের পাঠ শেষে শিক্ষকতা এবং তারপর বিজ্ঞানী হিসেবে 'ওয়াশিংটন ব্যুরো অব ফিসারিজ' এবং 'দ্য ফিস অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিস'— এ কাজ। আশৈশব কৌতূহলী রাচেল পুরো সময়ের লেখক হিসেবে কাজ করার জন্য সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন ১৯৫২ সালে। তিনি মনে করতেন বয়স্কদের উচিত শিশুদের জন্মসূত্রে পাওয়া প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে বিস্ময়কে বাঁচিয়ে রাখা ও বিকশিত করা। তিনি স্রোতের বিরুদ্ধে এমন এক সাহসী সাঁতারু, যিনি বিশ্বাস করতেন এবং কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণও করেছেন, সংখ্যা দিয়ে সত্য ঠিক হয় না। স্বার্থ ত্যাগ করতে হলেও, প্রয়োজনে এমনকি জীবনকে বাজি রাখতে হলেও, সত্যকে তুলে ধরার প্রত্যয় চাই। এই প্রত্যয়ীকে কেউ কেউ উন্মাদ বলতেও দ্বিধা করেননি। তথাপি ছাপ্পান্ন বছরের জীবনে একদিকে নিজের দেহের দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে রাসায়নিক বিষ থেকে প্রকৃতি ও পরিবেশকে বাঁচানোর লড়াই করেছেন তিনি। কোনকিছুই দমাতে পারেনি তাঁকে। তাই আজকের সময়ে তার লেখা বই 'সাইলেন্ট স্প্রিং' যেমন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক।

লেখিকা ও বিজ্ঞানী
রাচেল লুই
কারসন

কুইজ

(১) পৃথিবীর সবচাইতে বিষধর প্রাণীর নাম কি?

উঃ ফাইসেলিয়া।

(২) গোল কৃমির ডিম প্রতিকূল পরিবেশে কতদিন সজীব থাকতে পারে?

উঃ প্রায় ৭ বছর।

(৩) অক্টোপাসের ক'টি বাহু থাকে?

উঃ ৮টি

(৪) শত্রুর হাত থেকে অক্টোপাস কিভাবে আত্মরক্ষা করে?

উঃ অক্টোপাসের পায়ুর কাছে একটি থলি থাকে, যাকে কালির থলি বলে। উত্তেজিত হলে বা ভয় পেলে ঐ থলি থেকে এক ধরনের কালো পদার্থ নিঃসরণ করে। ফলে সমুদ্রের জল কালো হয়ে যায়। শত্রুরা ভয় পেয়ে এতে চলে যায়।

(৫) অক্টোপাস কি দিয়ে বাসা তৈরি করে?

উঃ পাথর দিয়ে। বিপদের সময় শত্রুকে এই পাথর দিয়ে আক্রমণ করে।

(৬) একবার উদরপূর্তি করে খাবার খেলে জোঁক কতদিন না খেয়ে থাকতে পারে?

উঃ প্রায় ২০০ দিন।

(৭) জোঁক কি বিষাক্ত প্রাণী?

উঃ না, বরং চিকিৎসাতে জোঁকের ব্যবহার হয়ে থাকে।

(৮) একটি প্রমাণমাপের উঁই ঢিবি বানাতে কি পরিমাণ মাটি ব্যবহৃত হয়?

উঃ প্রায় ১০ টন।

(৯) মৌমাছির মৌচাকের মধুচক্রগুলি কি আকৃতির হয়?

উঃ ষড়ভুজাকৃতি।

(১০) পুরুষ মশা কি খায়?

উঃ গাছের রস।

(১১) তারা মাছের গায়ে যে অসংখ্য ছোট ছোট কাঁটা থাকে তা কি দিয়ে তৈরি?

উঃ

(১২) স্ত্রী সমুদ্র ঘোড়া কোথায় ডিম পাড়ে?

উঃ পুরুষ সমুদ্র ঘোড়ার দেহে একটি থলি থাকে। স্ত্রী সমুদ্র ঘোড়া সেখানে ডিম পাড়ে।

(১৩) কোন্ মাছের লেজ দিয়ে চাবুক বানানো যায়?

উঃ শংকর মাছ বা স্টিংগ রে।

(১৪) কোন্ মাছ প্রজাতি বাচ্চা প্রসব করে?

উঃ হাঙ্গর (সার্ক)।

(১৫) সবচেয়ে বড় প্রজাতির হাঙ্গরের নাম কি?

উঃ তিমি।

(১৬) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যাঙের নাম কি?

উঃ গোলিয়াম ফ্রগ। ক্যামেরুন-এ পাওয়া যায়। একটি ব্যাঙ প্রায় ৩-৫ কেজি ওজনের হয়।

(১৭) সবচেয়ে ছোট ব্যাঙের নাম কি?

উঃ অ্যারো পয়জন ফ্রগ। কিউবাতে পাওয়া যায়। এদের দৈর্ঘ মাত্র ১০ মিমি।

(১৮) ব্যাঙ ফুসফুস ছাড়া আর কিসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালাতে পারে?

উঃ ত্বকের সাহায্যে।

(১৯) কচ্ছপ কত বছর বাঁচে?

উঃ প্রায় ১০০ বছর।

(২০) পৃথিবীর সর্ব বৃহত্তম কচ্ছপের নাম কি?

উঃ লেদার ব্যাক টারটল। প্রায় দেড় মিটার দৈর্ঘ এদের।

(২১) কচ্ছপ ঘণ্টায় কত কিলোমিটার বেগে সাঁতার কাটতে পারে?

উঃ প্রায় ৩২ কিমি/ ঘণ্টায়।

(২২) সদ্য প্রসবজাত কুমীরের বাচ্চা যে ডিমের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে সেই ডিম থেকে কতগুণ বড় হয়?

উঃ প্রায় ৩ গুণ।

(২৩) পুরুষ গিরগিটির ক'টি যৌনাঙ্গ থাকে?

উঃ দু'টি।

(২৪) অজগর সাপের ক'টি ফুসফুস থাকে?

উঃ দু'টি

(২৫) অজগর তার দেহের তুলনায় কতগুণ ভারী খাদ্য গ্রহণ করতে পারে?

উঃ প্রায় ৪০০ গুণ।

(২৬) কোন্ সাপের পা রয়েছে?

উঃ অজগরের পা আছে। তবে তা লুপ্তপ্রায় অঙ্গ।

(২৭) কোন্ সাপ বাসা তৈরি করতে পারে?

উঃ শঙ্খচূড় বা কিং কোবরা।

(২৮) কোন্ সাপ ডিম পেড়ে তাতে তা দেয়?

উঃ কেউটে।

(২৯) কোন্ সাপ শত্রু বা শিকারের চোখে বিষ ছিটিয়ে দেয়?

উঃ স্পিটিং কোবরা বা রিঙ্গ্যালস কোবরা।

জানা-অজানা কথা

বাঘ

।। ডাঃ তাপস কান্তি পাল।।

১। বাঘ যেটাকে ইংরেজিতে আমরা বলি "টাইগার"। আর এই "টাইগার" শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ 'টাইগ্রিস' থেকে যেটা আবার উদ্ভব হয়েছে পারসিয়ান শব্দ থেকে যার অর্থ হল "Arrow" বা "তীর"। এটা মনে করা হয় যে ধনুক দিয়ে নিক্ষেপ করা তীরের গতির সঙ্গে বাঘের গতির তুলনা করেই এই নামকরণ। আবার মনে করা হয় যে "টাইগ্রিস" নদী থেকেই এর এমন নামকরণ।

২। বহু দেশের সংস্কৃতিতেই বাঘের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। বিভিন্ন যুগ থেকেই বাঘ মানুষের আতঙ্ক, অনুপ্রেরণা ও শ্রদ্ধার কারণ হয়ে আছে। বাঘকে ভারত, বাংলাদেশ, কোরিয়া, মালয়েশিয়ার জাতীয় পশু হিসাবে গণ্য করা হয়।

৩। আমরা তো দেখি বাঘের শরীরে কি সুন্দর সুন্দর ডোরাকাটা দাগ বা স্ট্রিপ থাকে। কিন্তু এগুলি কি শুধু এদের পশমেই থাকে, মোটেই না। এই ডোরাকাটা দাগগুলি কিছুটা হাল্কাভাবে পশমের নিচের চামড়াতেও থাকে। আরেকটা মজাদার বিষয় হল এই ডোরাকাটা দাগগুলি বিভিন্ন বাঘের ক্ষেত্রে বিভিন্ন, যা দেখে বাঘকে সনাক্ত করা যায়।

৪। আমরা রোজই ডিসকভারি চ্যানেল বা অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট চ্যানেলে দেখি বাঘকে শিকার করতে। এরা কিভাবে করে এই শিকারগুলো। দেখা যায় বাঘ প্রথমে তাদের শিকারটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শিকারটির গলাতে কামড় বসায়। এতে যদি শিকারটির গলার ধমনী কেটে যায় তো শিকারটি মাটিতে লুটিয়ে পরে, নয় তো বাঘ শিকারটির গলা কামড়ে ঝুলে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত শিকারটি মারা যায়। বাঘ এই কাজে সবসময় যে সফল হয় এমনটা নয়, দেখা যায় যে এদের দশটি চেষ্টার মধ্যে মাত্র একটিই সফল হয়।

৫। বাঘ শিকার করার সময় অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাও আহত হয়। সেক্ষেত্রে তারা তাদের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটিকে জিহ্বা দিয়ে চেঁটে নেয়, কারণ এদের মুখের লালা রস খুব ভাল এন্টিসেপ্টিক হিসাবে কাজ করে।

৬। যদিও বাঘ বিড়াল পরিবারেরই অংশ কিন্তু এক্ষেত্রে বিড়ালদের থেকে এরা বিপরীত। বাঘ জল নিয়ে খেলা করতে পছন্দ করে। এরা সাঁতার কেটে কয়েক কিলোমিটার নদীপথ চলে যায় শুধু শিকার ধরার জন্য।

৭। বাঘকে সিংহের সঙ্গে প্রজনন করালে নতুন হাইব্রিডের জন্ম দেয় যাকে বলা হয় টাইগন বা লাইগার। টাইগন হল পুরুষ বাঘ এবং সিংহীর দ্বারা প্রাপ্ত হাইব্রিড। দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ হাইব্রিডটি প্রজননক্ষম হয় কিন্তু মহিলা হাইব্রিডটি প্রজনন অক্ষম হয়।

৮। বিভিন্ন মানুষকেই তাদের সাহস, শৌর্য ও শক্তির জন্য বাঘের সাথে তুলনা করা হয়। যেমন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বলা হয় 'বাংলার বাঘ'। বাংলাদেশের আবুল কাশেম ফজলুল হককে বলা হয় 'শের-এ-বাংলা'। আর টিপু সুলতানকে বলা হয় 'শের এ মহীশুর'।

৯। বাঘ তো সমস্ত প্রাণীরই শিকার করে, কিন্তু মানুষকে কি এরা এদের শিকার বা শত্রু বলে ভাবে, না মোটেই না। বাঘ আমাদেরকে শিকারের নজরে দেখে না, কিন্তু কোনভাবে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে, অসুস্থ হলে বা এদের শিকারের সংখ্যা কমে গেলে তবেই এরা মানুষকে আক্রমণ করে।

১০। বাঘ তো বনের সমস্ত প্রাণীকেই শিকার করে কিন্তু এদেরকে কি কেউ শিকার করতে পারে। হ্যাঁ একমাত্র মানুষই আছে যে বাঘকে শিকার করতে পারে। মানুষ তার প্রভাবশালীতা দেখানোর জন্য বা বাঘের চামড়ার লোভে একে শিকার করে। আবার অনেক স্থানে মনে করা হয় যে বাঘের শরীরের বিভিন্ন অংশ মানুষের রোগের ঔষধি, আর তারজন্য বাঘকে শিকার করা হয়। তাই তো আজকের দিনে বাঘের সংখ্যা এত হ্রাস পেয়েছে।

The Institution of Engineering & Technology (India)
An autonomous body as per present policy of AICTE,Govt.Of India
Programs Offering
AMIET(I) - Degree & DIPIET(I) - Diploma
CIVIL, MECHANICAL, ELECTRICAL and ELECTRONICS & COMM.
To open Students' Chapter / Study Centre.
Contact : "Engineers' House", 81, Golaghata Road,(VIP Road), Kol - 48 W.B., India, E-mail : ietindia2011@gmail.com,Web: www.ietindia.org
PH - 9874446593 / 9674761499 / 033-64444008

রসায়নে আরও একটি নতুন ফর্মুলা আবিষ্কার করলেন ড. অরিজিৎ দাস

ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের রসায়ন বিভগের প্রধান অধ্যাপক ড. অরিজিৎ দাস সম্প্রতি রসায়ন বিষয়ে আরও একটি নতুন ফর্মুলা আবিষ্কার করলেন। আনবিক তত্ত্বচিত্র ছাড়া অণু, আয়ন এবং আম্লিক মূলকের বন্ধনক্রম বের করার জন্য কাজে লাগবে তার এই নূতন ফর্মুলা। তার এই আবিষ্কার প্রকাশিত হয়েছে Feb-2013, Vol 22 (02), Page-(13-15) কেমিস্ট্রি টুডে নামক রসায়ন গবেষণা গ্রন্থে (I.S.B.N-2468) যা দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়। তার এই আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিয়েছে দেশের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়— কলকাতা, যাদবপুর, বর্ধমান, হায়দ্রাবাদ, অসামানিয়া, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (ব্যাঙ্গালুরু), নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি এবং ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কল্যাণী ইউনিভার্সিটি। স্বীকৃতি এসেছে ৪টি আই আই টি থেকে — আই আই টি কানপুর, আই আই টি খঙ্গাপুর, আই আই টি গুয়াহাটি, আই আই টি পাটনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ড. দাসের এই নূতন আবিষ্কৃত ফর্মুলার সাহায্যে ছাত্র- ছাত্রীরা বন্ধনক্রম তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে বের করতে পারবে যা বইয়ের প্রচলিত সূত্র দিয়ে বের করতে সময় লাগতো কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাত মিনিট।

এখানে উল্লেখ্য, ড. দাস ইতোপূর্বে রসায়নের আরও দু'টি নূতন ফর্মুলা আবিষ্কার করেছিলেন "সংকরায়ন" এবং "বাই সাইক্লো ও স্পাইরো যৌগের ইউপেক" নামকরণের উপর। ড. দাসের আবিষ্কৃত এই তিনটি ফর্মুলা ব্যবহারের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময় সশ্রয় হবে। দেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ড. দাসের আবিষ্কৃত এই তিনটি ফর্মুলাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে যাচ্ছে।

প্রতিদিন হাঁটুন, শরীর চর্চা করুন

।। ডাঃ মনোজ দে।।

মহিলাদের জন্য পরামর্শ

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের হাড়ের অসুখ এখন রীতিমতো চিকিৎসকদের কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। আগে প্রতি ১০-১২ জন মহিলা রোগীর মধ্যে দেখা যেত হাড়ের সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসছেন একজন মাত্র। আর এখন এই সংখ্যা পাঁচ-ছয় গুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু কেন? কারণ অনেক।

১। আগের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি মহিলা কর্মরত।

২। মদ্যপান অথবা ধূমপানে অধিকাংশ মহিলা অভ্যস্ত।

৩। ফাস্টফুডের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক।

৪। খারাপ দেহভঙ্গি (Bad posture)

৫। ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবারের প্রতি অনীহা।

৬। নিয়মিত শরীরচর্চার প্রতি অবহেলা।

৭। দ্রুতময় জীবন।

৮। কম্পিউটারে অধিক সময় কাটানো।

৯। ওবেসিটি।

১০। কর্মস্থল ও জীবনে অধিক চাপ ইত্যাদি।

হাড়ের যে সমস্যা নিয়ে বেশিরভাগ মহিলা চিকিৎসকের কাছে আসেন তার মধ্যে অন্যতম হলো অস্থিক্ষয় বা অস্টিওপোরোসিস। অর্থাৎ ফোঁপড়া হাড় যা দেখতে অনেকটা বাতাসার মতো হয়ে যায়। প্রসঙ্গত বলি, গোটা বিশ্বে হাড়ের সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে আসা মহিলাদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনই এই রোগের শিকার। সুতরাং এখন একটি ব্যাপারে মন দেওয়া যেতেই পারে, যা হলো মহিলাদের ক্ষেত্রে হাড়ের সমস্যা প্রতিরোধে কী কী করণীয়:

- প্রতিদিন কমপক্ষে আধ ঘণ্টা হাঁটুন।
- শরীরচর্চা করুন। তবে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের পরামর্শ ছাড়া নয়।
- ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ সুষম খাবার খান।
- দৈহিক ওজন বাড়াবেন না।
- রোগা হতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ব্যায়াম আর নামমাত্র আহার ভুলেও নয়।
- অলসভাবে দিনযাপনও হাড়ের সমস্যা ডেকে অনতে পারে। কোনো না কোনোভাবে শারীরিক পরিশ্রম দরকার।
- জীবনচর্চার পরিবর্তন আনুন। একটানা অনেকক্ষণ একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বা বসে কাজ করা উচিত নয়।
- আর্লিমেনোপজ হলে অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- শরীরে রোদ লাগান। যাতে ভিটামিন -ডি'র ঘাটতি না হয়।
- হৃদরোগের সমস্যা না থাকলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করাই ভালো। তবে তা যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়।
- হাড়ে ক্যালসিয়াম যথাযথ পরিমাণে আছে কিনা তার জন্য ডেক্সা স্ক্যান (Dexa Scan)করান সমস্যা থাকলে দ্রুত চিকিৎসা করান।